অপরাহ্ণ সুস্মিতো'র একগুচ্ছ কবিতা

দ্রোণচার্য

[গহন অরণ্য থেকে জল এনে দাও আমাকে
হাতে ধরে রাখি সাধনার স্মৃতি রাশি
বালুচর থেকে হাত নেড়ে ডাকি
আজি কেবলি প্রণমি তোমাকে ছাড়িব না]

পার্থিব পুকুর থেকে উল-ম্ব জেগে ওঠা
একজন মেরুহীন মানুষ-
সাথে জোৎস্নার চুল ছিঁড়ে নোঙর ফেলে রেখে
কালো কালো পুঁজ রক্ত অশুদ্ধ মন্থন
সরীসৃপের গর্তে বাস করে না শান্ত বিবর
নিঝুমতলার কোন নিঝুমদ্বীপে
বাস করে কোন ঈশ্বরীয় স্বর্গ - বলে বেড়ায়
কল্পিত দেবদূত

আলো দেখে কেবলি প্রণমি তোমাকে ছাড়িব না

৩০ আগস্ট ১৯৯৮

অসম অভিবাসন

বিমল ছন্দে উল্টে পড়ে হাতের গ-াস. লাল তরমুজ
অসুস্থ মানুষের একটি গোটা দিন ও
সরু নখের নেলপালিশ
ভ্রুকুটি রেখে দৌঁড়ে যায় নবাগত বালক
নবীন শহরে।
অসম অভিবাসন ক্রমশ: দেয় নিরাকার দুঃখ
নিরাকার দুঃখ দেয় বেমানান অস্তিত্ব
আলো হাতে চাষাবাদ করে
সৌরলোকে অপার্থিব বীজতলা।
নবাগত বালক মানেনা মওসুম
সূর্যের উত্থান পতন ও রবিকালের চঞ্চল পাখি।

ধারে রাখে মুঠো করে আগামী বীজ।

১৭ জুলাই ১৯৯৮

তুমি পারো, ঐশ্বর্য

তুমি পারো, আমার ঐশ্বর্য
ধনুকের ছিলায় তীব্র দাঁড় বেঁধে প্রস্তুত বেঁধে রেখে দাও
শুভ্র তীরন্দাজ
রঙধনু রাঙা নিয়ে তো রাখো মিহিন ও মোহন সময়ের
আধুনিক অতিথি, বুদ্ধদেবের ছোকানু।
তুমি তো পারো
ও আমার শামুক মৌলবাদ বিরোধী শরীর,
আমার নিজের জন্মের ভূমি ধারালো জলদাস
কালের বন্ধনে চুমু রেখে রেখে তবু তৃষ্ণার্ত রেখে দাও
এই বাংলাদেশ আমার পরশুর পরের দিন।
কোলাহল ছেড়ে একটু বেশী দূরে তবে অভিবাসন থেকে কাছে
ছোট্ট হালুম করে ওঠো
ছেলেবেলাকার গোপন পত্রিকার
ও সুকুমার শিহরণ!
নির্বাক করে রাখো না এই একটি ছোট্ট পেরেকের দিনমান বেলা
জলে জলে কদম করে রাখো বৃষ্টি আর বৃষ্টির সর্বনাশের একটি দিন,
গোলালুর মতো খানিক অকৃতকার্য জীবনের কাছে পরাজিত হরতাল
জমা করে রাখো জমা করে রাখো।

আমার ভাত বেড়ে দাও আমার মা
নেভানো চুলা থেকে কিছু লাল কয়লাও থাকুক
আমাদের যাত্রায় যন্ত্রণায়
উনোনে উঠোনে ও শীতকালে
ই-মেলের গতি করে দাও
তোমার দূরের ঝকঝকে বইয়ের পাতায়, উম্মুখে।
তুমি পারো, ঐশ্বর্য।
কত ভুলের মালা করে বানভাসি বিসর্জন করো আমার প্রতিমা
পানি থেকে রঙ নেয়া স্বার্থপর শামুক

কিছু না হোক
ছোট করে টোকায় ভয় পাইয়ে দাও সামরিক খোলস
গ্রন্থিত অগ্রন্থিত ভুল শিক্ষা দীক্ষা মৌলবাদ
ও
কোনো কোনো শিক্ষকও।
মনে থাকে যেন, আমার ঐশ্বর্য।

সেই কবে তোমার শহর তোমাকে রেখে এসেছি
কোমল পাহারায় রেখেছি দেখে শুনে
সেই ছেলে ও যাবতীয় ভঙ্গিমার তরুণ ছবি।

মনে রেখো তুমি পারো, ঐশ্বর্য।

২১ জুন ২০০১

মন্ট্রিয়ল, কানাডা

সিকদার আমিনুল হকের কবিতা

সন্ত্রাস

অশান্তির মধ্যে আছি। আশা অল্প। নিরাপত্তা কম।
বয়সের ভারে বাড়ে শুধু চর্বি, রাত্রে ভয়ে থাকি
যখন দাপিয়ে যায় এ্যাম্বুলেন্স, পাড়াসুদ্ধ কাঁপে
মৃত্যুভয় আর দস্যুতায়। ... এই গন্ধ বজ্জাতির;
মোটে তো শ্রাবণ মাস, রক্তচাপে শীতে ভালো থাকি।
গালগল্পে দিন কাটে, কমে গ্যাছে আহারের রুচি;
ফ্রিজ খুলে জল খাই; কিছু লিখি নিস্প্রাণ চিন্তায়।
কেউ কি স্বস্তিতে আছে, গ্রাম-শহরের কাছাকাছি?

অশান্তিকে বুকে নিয়ে রিকসা যায়। গাঢ় রাত্রি নামে।
এক'শ ফিটের রাস্তা অবিকল দীর্ঘ অজগর;
ঘুমেও হয় না ক্লান্ত, ভয়াল সন্ত্রাস রোজ ঢোকে
গৃহস্থের ঠাণ্ডা ঘরে। অশ্লীল শব্দকে ছুঁড়ে দ্যায়
বিব্রত মেয়ের দিকে মাস্তানেরা! আচমকা শুনি
একটি পিস্তল বলে, সব দাও! – যার যাহা আছে!

BANGLADESH MARKET

6069 Cahalan Ave., San Jose, CA 95123

(408) 225-8887

যাবতীয় বাংলাদেশী গ্রোসারী সামগ্রী এবং বাংলাদেশী, পাকিস্তানী ও ভারতীয় সহ সব ধরনের অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট পাওয়া যাচ্ছে।

আমাদের এখানে সবধরনের
হালাল মাংস, বাংলাদেশী মাছ
পাওয়া যায়

অমর গান

মিজান রহমান

আমার দৈনিক রুটিনের কথা কাউকে বলি না কারণ ওটা বলবার মত নয়। রুটিন জীবনের মত নীরস জিনিস সংসারে আর কিছু নেই। আমি যখন ঘুম থেকে উঠি তখন পাখিরা ছাড়া আর কেউ ঘুম থেকে ওঠে না। আমি যখন ঘুমাতে যাই তখনও শুধু পাখিরাই ঘুমাতে যায়। বয়স হলে বোধ হয় পাখিদের সঙ্গে একটা সখ্যতা হয়ে যায় মানুষের। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আগে আমার কোন বাছবিচার ছিল না। এখন আমার এত বাছবিচার যে আমার জন্যে খাবার তৈরির ভয়ে লোকে এখন দাওয়াতই করে না আমাকে। আগে আমার ব্যায়ামটা সীমাবদ্ধ ছিল বাজারের সদাই গাড়িতে উঠানো আর গাড়ি থেকে নামানোর মধ্যে। এখন আমি রোজ ব্যায়ামাগারে যাই, সাঁতার কাটি জাঙ্গিয়া পড়ে। এক ভারতীয় বন্ধুর স্ত্রী আমাকে বললেন আমি নাকি শ্বাস প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া শিখিনি। ওমা, সে কি কথা। এতগুলো বছর তাহলে বেঁচে রইলাম কি করে। না না সে কথা বলছি না আমি, বন্ধুপত্নীর কণ্ঠে খানিক অধৈর্য। আমি বলছি, তুমি সঠিকভাবে শ্বাস নিচ্ছ না। তিনি আমাকে বুঝালেন যে দুরকমের শ্বাস আছে। একটা বেঠিক যেটাতে বুকের ওঠানামা হয়, আরেকটা সঠিক যেটাতে শুধু পেটের মাংস নড়ে। সুতরাং আমাকে সঠিক শ্বাসের কায়দা শিখতে হল। পশ্চিমে এই সঠিক শ্বাসটাকে বলা হয় ব্রিদিং এক্সারসাইজ। ভারতে এই জিনিসটিকেই বলা হয় প্রাণায়াম।

তাই আমি প্রাণায়াম করি রোজ বিকেল বেলা। ভাল লাগে না পারলে বন্ধ করি। প্রাণবায়ুটা যদ্দিন শরীরে আছে তদ্দিন অন্তত শ্বাসপ্রশ্বাসটি ঠিকভাবে করা উচিত বৈকি। প্রাণায়ামটা আমি করি ছোটছেলের ঘরে যেখানে তার পুরনো স্টেরিও সেটটা এখনো আছে। এত পুরনো যে সে যাবার সময় এটাকে সঙ্গে নিয়ে যায় নি। সিডি পে-য়ারটা অনেকদিন ধরেই কাজ করে না, স্পীকার দুটোর একটাও পরিষ্কার শোনা যায় না। তবু আমার জন্যে এই যথেষ্ট। আমি সে যুগের মানুষ যে যুগে লোকে চাবি দিয়ে কলের গান বাজাতো। আমি সিডি দিয়ে কি করব। আমার গানের কালেক্শনও একইরকম হাস্যকর। ইজ্জত যেতে পারে বলে সেটা না হয় চাপাই থাকল। তবে আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত পছন্দ করি। নিজে গাইতে পারি না তবে শুনতে ভাল লাগে। আমার সহৃদয় বন্ধুরা মাঝে মাঝে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্যাসেট পাঠিয়ে দেন আমাকে, তাই শুনি মাঝে মাঝে। আর শুনি আমার ছেলের পিয়ানো। আমাদের জন্যে সে স্টুডিওতে গিয়ে টেপ করেছিল ক'টা বিখ্যাত পিস্। বেটোফেনের দুটি সোনাটা, ব্রাম্সের কনচার্টো, শোঁপার পলনেজ , শুবার্ট, প্রকফিয়েভ ইত্যাদি। ওগুলোও পুরনো হয়ে গেছে। তবু বার বার বাজাই ওগুলো। স্মৃতিগুলো ঢেউ খায় মনে। স্বপ্নগুলো ফিরে আসে ধূলার ডানাতে করে। আমি হারিয়ে যাই।

সেদিন আমার হাস্যকর কালেক্শনটা ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম। চোখে পড়ল ধূলার স্তূপ জমা একটা পুরনো টেপ। উপরে লেখা আছে: চলি-শ আর পঞ্চাশের হিন্দী গান। ওটাও আমার এক সমকালীন বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া। আজকাল আমি বোম্বাই বা মুম্বাই'র হিন্দী গান একেবারে সহ্য করতে পারি না। গত চলি-শ বছরের মাঝে আমি একটিও হিন্দী ছবি দেখিনি। কিন্তু চলি-শ আর পঞ্চাশ দশকে যখন আমি স্কুল-কলেজের ছাত্র তখন ঢাকায় ছবি বলতে সাধারণত হিন্দী ছবিই বোঝাত। গান বলতে বোঝাত লতা মুঙ্গেশকর, শামসাদ বেগম, নূরজাহান, আশা ভোঁশলে, মোহাম্মদ রফি, মুকেশ, তালাত মাহমুদ। ভালমন্দের বিচার আজকে আমি যতই করি না কেন, বলতে দ্বিধা নেই যে, আমিও সেই কালচার থেকেই বড় হয়েছি। নতুন কোন হিন্দী গান বাজারে চালু হলে আমিও কান পেতে শুনতাম। এমনকি নিজেও গাইবার চেষ্টা করতাম আমার এই অসাধারণ বেসুরো গলায়। তাই আমার রক্তে এখনো রয়ে গেছে সেই পুরনো সুরের আবেশ।

টেপটা চড়িয়ে দিলাম ডেকের ওপর। প্রাণায়াম করতে করতে গানগুলো শুনছিলাম একে একে। সবচেয়ে পুরনোটা কিন্তু শামসাদ বেগমের একটা নামকরা গান: 'রুমঝুম বরসে বাদালুয়া, মাস্ত হাওয়ায়ে আয়ি, পিয়া ঘর আযা আযা...।' 'রতন' ছবির গান, যতদূর মনে পড়ে। বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়: 'এই রিমঝিম বর্ষার দিনে, এই ঝড়বাদলায়, প্রিয়, তুমি ঘরে ফিরে এসো।' আজকের মন দিয়ে যাচাই করলে এমন কোন আহামরি গান নয়। চণ্ডীদাসের 'এহেন হৃদয়ে এ মোহ ভাদরে শূন্য হৃদয়মম' বা রবীন্দ্রনাথের 'আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে, বৃষ্টিবাদল বিষন্ন নিঃশ্বাসে'-এসব অমর রচনার পাশে দাঁড়ানোর যোগ্য একেবারেই নয়। কিন্তু আজকের মন আমার ছিল না সেকালে। সেকালে 'রতনের' হিন্দী গান শুনেই আমার মন উদাস হয়ে পড়ত। আমার অশান্ত কিশোর প্রাণ সেই বর্ষার ছন্দে নেচে উঠত তুমুল উচ্ছ্বাসে। আমি মাঠে ঘাটে পথে ঘুর করে গাইতাম সেই সব গান। আমার ভাইবোনেরা কানে হাত দিয়ে রাখত আমার গান শুনে, তবু গাইতাম। মনে আছে, 'রতন' ছবিটা দেখার জন্যে আমি ঢাকা থেকে কলকাতা গিয়েছিলাম, এক চাচাতো ভাইয়ের বাসায় বেড়াতে যাবার নাম করে। ছবিটা দেখে সবার মত আমিও খুব কেঁদেছিলাম। কাঁদার জন্যেই তো দেখা। আমার স্কুলের বন্ধু নিজাম খুব গাইত 'রতনে'র গানগুলো। গাইতে গাইতে তার চোখ দিয়ে পানি পড়ত। আজকে আমি 'রতনে'র গান শুনে কাঁদব না। আজকাল আমি হিন্দী গান শুনি না, শুনলেও সেটা কোনরকম আবেগ সঞ্চার করে না আমার প্রাণে। কিন্তু

‘রতনে’র সেই হারানো দিনগুলো, সেই মূঢ় কৈশোর, সেই অপরূপ বিমর্ষ বর্ষাগুলো এখনো মোচড় দেয় বুকে। পুরনো হিন্দী গান শুনলে এখনো চোখের সামনে ভাসে প্রিয়বন্ধু নিজামের মুখ। সেবার গিয়েছিলাম কলতাবাজারের কুট্টিপাড়ায় নিজামের সঙ্গে দেখা করব বলে। চলি-শ বছর ধরে দেখিনি তাকে। এককালে আমরা রোজ স্কুলে যেতাম একসাথে হেঁটে। আমি তাকে অংক শেখাতাম, সে আমাকে সিগারেট খাওয়াত। আসলে ধূমপানের তালিমটা আমি ওর কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। কিন্তু দেখা হল না তার সাথে। তার বড় ভাই আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। আমিও কাঁদলাম। নিজাম তো নেইরে ভাই, বললেন তিনি। ভেবেছিলাম, দেখা হলে বলব, সেই পুরনো গানগুলো মনে থাকলে গেয়ে শোনাও একটা। সেটা আর হল না।

ইংরেজ কবি বলেছিলেন, সবচেয়ে মধুর গান হল ওটা যাতে আছে সবচেয়ে বেদনার কাহিনী। আমার জন্যে সবচেয়ে মধুর গান হল যা আমি আর গাইতে পারব না। যা আমি আর কোনোদিন শুনব না বন্ধু নিজামের কাছ থেকে। সবচেয়ে কাম্য বস্তু আমার হারানো সারল্য - আমার বাল্য, কৈশোর, যৌবন। বাল্যে আমি বালক হতে চাইনি, কৈশোরে হতে চাইনি কিশোর, যৌবনে বুঝিনি যৌবনের মূল্য। এখন আমার কোনটাই নেই, অথচ কাতরতা সবগুলোর জন্য। জর্জ বার্নার্ড শ’ এক জায়গায় বলেছিলেন, যুবক-যুবতীরা যৌবনের যোগ্য নয় - যৌবনের মত সুন্দর জিনিসের মিথ্যে অপচয়মাত্র। হাসি পায় বললে, কিন্তু কথাটা হাসবার নয়। সময় ফুরিয়ে যাবার আগে মানুষ কোনদিন সময়ের দাম দেয় না।

আজকে আমি হিন্দী গান সইতে পারি না অথচ ছোটবেলার হিন্দী গান শুনে মন ভিজে যায় এখনো। ছোটবেলার গানের মত মিষ্টি গান সংসারে আর একটি নেই, ছোটবেলার খাবারের সব স্বাদু খাবার নেই কোথাও। সেই বাধাবন্ধনহীন উদ্বেল উদ্দাম দিনগুলি। কত না দুষ্টুমি করেছি সে বয়সে। স্কুলের ক্লাস কামাই করে সিনেমা দেখেছি। সিনেমা থেকে বাসায় ফেরার পর দম বন্ধ করে রেখেছি যাতে বাবা-মা আমার শার্টে ধূমপানের গন্ধ শুঁকে বুঝতে না পারেন কোথায় গিয়েছিলাম। বন্ধুর সাথে পড়তে যাবার নাম করে আড্ডা মেরেছি, কেরাম খেলেছি, তাস খেলেছি। লুকিয়ে লুকিয়ে বিনা টিকিটে ট্রেনে করে ঘুরে বেড়িয়েছি নানা মুল-ুকে। সেই সব সোনালি দিনের স্মৃতি ‘রতনে’র গানের সেই সান্ত হাওয়ার মত ধেয়ে ক্রমে আসে মনের আঙিনায়। আমার সবচেয়ে মধুর গান সেই সব স্মৃতি। আমার স্ত্রী বলেন, আমার স্মৃতিশক্তি কমে যাচেছ। আমি কারো নাম মনে রাখতে পারি না। সকাল বেলা কি করেছি বিকেল বেলা সেটা মনে থাকে না। বসার ঘর থেকে রান্নাঘরে গিয়ে ভুলে যাই কেন এলাম। অথচ দূরের অতীতকে আমি ভুলতে পারি না। পশ্চাত যতই পেছনে ছুটতে থাকে ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমার চোখে। প্রকৃতি বুঝি এমনি করে নিষ্ঠুর খেলা করে মানুষের সাথে।

আমার বাবার যৌবনে মাঝে মাঝে সুর করে গাইতেন বাড়ির ভেতর। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় গান ছিল রবি ঠাকুরের ‘সীমার মাঝে অসীম তুমি...’। গানটার আধ্যাত্মিক দিকটার কথা ভেবেই হয়ত এত ভালবাসতেন এটাকে। আমি নিজে ওটা গাই না, কিন্তু কাউকে গাইতে শুনলে বাবার মুখটা ভেসে ওঠে আবার। যেন তিনি এখনো গাইছেন। আমার নিজের যৌবনেও বাড়ির চার দেয়ালের ভেতরে আবোল তাবোল অনেক কিছু গাইতাম আমি। বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী যখন যা মনে আসে। তার মধ্যে একটা গানের প্রথম লাইনটা ছিল: ‘লেমন ট্রি ভেরী প্রিটি’। সেটা আমার ছেলেরা মনে রেখেছে, যেমন করে আমি মনে রেখেছি আমার বাবার ‘সীমার মাঝে অসীম তুমি’। বড় ছেলে তার বাগানে একটা লেবু গাছ লাগিয়েছে শুধু ঐ কারণে। সে নিজে কি গান গায় বাড়িতে জানি না। একদিন তার ছেলেও একইভাবে মনে রাখবে সেগুলো। হয়ত তার বাগানেও এমনি কোন স্মৃতিফলক দাঁড়িয়ে থাকবে আগামী প্রজন্মের জন্য। মানুষের স্মৃতির অশ্রুধারা তো এমনি করে বয়ে যায় যুগ থেকে যুগান্তরে, লোক থেকে লোকান্তরে। সেটাই তো মানুষের অমর গান। সবচেয়ে মধুর গান। ❐

অটোয়া, কানাডা।
২৭শে জুন, ২০০১।

স্বরব্যঞ্জনের বিজ্ঞাপন

সেরেনডিপিটি – হঠাৎ আলোর ঝলকানি

নন্দিতা ভাটনগর

১৯৮১ সালে পূজোর সময়ে কলকাতার উপান্তে আমার পিতৃপুরুষদের ৩০০ বছরের প্রাচীন বসতবাটিতে একসঙ্গে হয়েছিলাম ভাই-বোনেরা সবাই। শেষবারের মতোই। একান্নবর্তী পরিবারে এই বাড়িতেই কেটেছিল আমাদের শৈশব, কৈশোর আর প্রথম যৌবনের ছুটির দিনগুলো। তারপর এই প্রথম একসঙ্গে হওয়া। সকলেই তাদের অর্ধাঙ্গ-অর্ধাঙ্গিনীদের বাদ দিয়েই চলে এসেছিল সেবারে স্রেফ নির্ভেজাল আড্ডা আর স্মৃতিচারণের উদ্দেশে।

একদিন হঠাৎই রাত্রির বেলায় প্রস্তাব এল– 'চল্, কালই বিষ্ণুপুর যাই'। কোন প্রস্তুতি নেই, খবর জানা নেই, গাড়ির ব্যবস্থা নেই, সবচেয়ে বড় কথা থাকব কোথায়? এক বোন বলল, হ্যাঁ: তার আবার যত্তো সব ট্র্যাভেল এজেন্ট, এডভান্স বুকিং! আরে এই যে হঠাৎ যাওয়া, এর মতো রোমান্টিক আর কিছু আছে কি? আরেক ভাই দিল আঁতে ঘা – এই রবীন্দ্রনাথ আওড়াস উঠতে বসতে, কী বলেছেন বৃদ্ধ?

- কী বলেছেন?

- আরে ঐ যে 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া/ ঘর হতে' শুধু দুই পা ফেলিয়া/ একটি ধানের শিষের উপরে/ একটি শিশির বিন্দু'। খুব তো চষে বেড়ান পৃথিবীর পথে প্রান্তরে, বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির মন্দির কী জিনিস তা তো জানিস না। মানতেই হলো কথাটা। আমার কর্তাটিও ভবঘুরে, একটু যে মন কেমন করেনি তা বলব না। কিন্তু তার প্-ল্যানিং চলে ভ্রমণের প্রতি ধাপে, সেইটাই নাকি অর্ধেক আনন্দ। সে এরকম – 'ওই ছুঁড়ি তোর বিয়ে'তে রাজি হতো কিনা কে জানে। তার কথাটা মন থেকে বেমালুম ঝেড়ে ফেলে হুজুগে মেতে উঠলাম।

পরদিন সাত সকালে উঠে গ্রামের বাস স্ট্যান্ড থেকে লক্কড় বাসে - প্রথমে ছ'মাইল দূরে ট্রেন, তারপর আরেকটা বাসের ধাক্কা সামলে দুপুরের দিকে পৌঁছে গেলাম বিষ্ণুপুরে। পূজোর মরশুমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথিশালায় বিনা বুকিং-এ জায়গা পাওয়া, পোড়ামাটির মন্দির দেখে হতবাক হওয়া এক জ্যোৎস্না ভরা রাতে পতিঘাতিনী সতীর ঘাটে হাঁটতে যাওয়া – এসব অন্য কথা। এভাবে শুধু বলব বিষ্ণুপুরে পথের বাঁক ঘুরতে গিয়ে হঠাৎ এক অভাবনীয় ঐশ্বর্য খুঁজে পাওয়ার কথা। একেই বোধহয় ইংরেজিতে বলে 'সেরেনডিপিটি'।

আগের দিন মন্দির ইত্যাদি দেখে শুনে পরের দিন সকালে লক্ষ্যবিহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখি আমরা এসে পড়েছি তাঁতিপাড়ায়। একটু ভেতরে ঢুকে দেখি কয়েকজন মিলে বুনছেন একটা চমৎকার অথচ অন্য রকমের শাড়ি! ১৯৫৭ সালে যখন দেশ ছেড়েছি এ জিনিস দেখে যাই নি। এ শাড়ির আঁচলে পাড়ে তাঁতিরা বুনছেন গল্প! নাম শুনলাম 'বালুচরী'। এ নাম ছেলেবেলায় ঠাকুমা দিদিমা'র মুখে শোনা ছিল, চোখে দেখা এই প্রথম। ওই শাড়িটার দাম জানলাম ৭৫০ টাকা, তখনকার ক্যানেডিয়ান একশ' ডলার। আমার পুরনো মানসিকতা ও হিসেবে অতটা দাম দিতে বিবেকে বাধছিল। বোনেরা দেখলাম বেশ ওয়াকিবহাল এ ব্যাপারে। বলল, এ শাড়ি কলকাতায় গেলেই হয়ে যাবে ১০০০-১৫০০ টাকা। আমাদের ওইরকম দামই দিতে হয়েছে। কিনে ফেল। তাঁতিরাও সে কথায় সায় দিলেন। ওঁরা শুনলাম 'ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউস' এ বালুচরী জোগান দেন, অতএব কেনা হলো। একেবারে তাঁত থেকে খুলেই। প্রায় শেষের দিকেই ছিল বোনার কাজটা। ওঁরা বিকেলের মধ্যে শেষ করে আমাদের বাসে ওঠার আগে হাতে তুলে দিলেন। সেই সময়ে আইভরী বা ঘিয়ে রঙের জমিতে বাদামী বা লাল সূতোর কাজই 'ট্রাডিশনাল' বালুচরীতে জনপ্রিয় ছিল। গত ২০ বছর ধরে সে শাড়ি পরেছি। একঘেয়ে লাগতে আরম্ভ হয়েছে, অথচ ছেঁড়বার কোনই লক্ষণ নেই, এমনই মজবুত জমি। এবারে দেশে যাবার সময়ে নিয়ে গেলাম, যদি কারো শাড়ির সঙ্গে বদলাবদলি করে নেওয়া যায়। কিন্তু একদিন রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর একটা নামী দোকানে ঢুকে দেখি হুবহু আমারই শাড়িটা বুনছে; কেবল বোনা গল্পটা অন্য। দাম শুনলাম ৫০০০ টাকা। বিষম আর খাবি খাওয়ার মাঝামাঝি একটা শব্দ গলা থেকে বেরিয়ে এর আর আমিও বেরিয়ে এলাম পত্রপাঠ। তৎক্ষণাৎ ঠিক করিলাম এ শাড়ি হাতছাড়া করা চলবে না একদম। শুনেছিলাম 'বালুচরী'র একটা ইতিহাস আছে। ভাবলাম নিদেন পক্ষে সেই কাহিনী সন্ধানেই লেগে যাই; অন্তত ইতিহাসটা পড়েও শাড়িটার একঘেঁয়েমির কথা হয়ত ভুলে যাব। সেই ইতিহাসই বলছি এবারে। পাঠিকাদের মধ্যে হয়ত সবারই একটি অন্তত বালুচরী রয়েছে। এই প্রতিবেদনটি পড়বার পর তাঁরা শাড়িগুলো আরো বেশি যত্নে রাখবেন বলেই মনে হয়।

++++++++++++++++++++++

'বালুচরী' নামটা এসেছে মুর্শিদাবাদের বালুচর গ্রাম থেকে। ইতিহাস বলছে ওই অঞ্চলেই ১৭৫৭ সাল থেকে ধনী অভিজাত হিন্দু এবং মুসলমান নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিল্পটি

লালিত হয়েছিল। নবাবরা বোনাতেন 'ট্যাপিস্ট্রি' দেওয়ালে ঝোলাবার জন্য আর হিন্দুরা চাইতেন শাড়ি। বালুচরী ট্যাপিস্ট্রি'র সন্ধান তেমন মেলে না। কিন্তু কিছু প্রাচীন শাড়ি এখনও আছে কলকাতার বনেদী পরিবারের নিজস্ব সংগ্রহে কিংবা বিভিন্ন সংগ্রহশালায়। দুঃখের বিষয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 'বালুচরী' হারিয়ে গেল। কারণটা নানাবিধ। 'বালুচর' গ্রামটি তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে গঙ্গার ভাঙনে। তাছাড়াও অন্য কারণ ছিল। এই সূক্ষ্ম রেশম বিলেতী কাপড়ের প্রধান প্রতিবন্ধী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইংরেজের শাসনে তাঁতিরা বাধ্য হয়েছিলেন জাতব্যবসা ছেড়ে দিতে। ওই সময়ে অভিজাত পরিবার এবং রাজন্যবর্গের আর্থিক সংস্থানে ধরেছিল ভাঙন, তাঁরাও আর এই ধরনের বিশেষ শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারছিলেন না। মোট কথা যে কারণটাই প্রধান হোক না কেন বালুচরীর তন্তুবায় গোষ্ঠী স্রেফ খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার জন্য অন্যান্য পেশা গ্রহণ করলে হারিয়ে গেল বালুচরী বুননীর অনন্য কাজ! শেষ বালুচরী তন্তুবায় দুবরাজ দাস দেহত্যাগ করেছেন ১৯০৩ সালে। দুব্রাজ ও অন্য কয়েকজন শিল্পীর দস্তখত করা কয়েকটি শাড়ি পাওয়া গেছে। ভারতীয় কারিগরদের এভাবে নিজের স্বাক্ষর রেখে যাবার নজির এখনও বিরল!

কোন কোন সমীক্ষকরা বলেছেন যে বালুচরীর বুননীটা এসেছে গুজরাটের 'পাটোলা' তাঁতিদের কাছ থেকে, তাকে বলে 'জালা' বুনন। সে যাই হোক, প্রাচীন আমলের বালুচরীতে টানার দিকে খুব সূক্ষ্ম প্যাঁচ দেওয়া রেশম সূতো আর পাড়নের বুননীতে খাটি রেশম সূতো ব্যবহার হতো। 'পল-ভ' অর্থাৎ আঁচলের কারুকাজে ব্যবহার করা হতো প্যাঁচ না দেওয়া সূতো যাতে আঁচলটাই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। আঁচলের গপ্পয় থাকতো সে যুগের সমসাময়িক চিত্র যথা, হুঁকো হাতে সাহেব-বিবি, পেছনে হুঁকো বরদার; ফরসি হাতে তাকিয়া হেলান দিয়ে নবাব; পাল্কী বা হাওদায় বসে নবাব/বাদশা, রাজা-মহারাজা। এ শিল্পটিকে নতুন প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন এ যুগের তন্তুবায় শিল্পীরা এবং সেটির পৃষ্ঠপোষকতাও করে চলেছেন গুণগ্রাহীরা। কিন্তু যাঁরা প্রাচীন বালুচরী স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁরা বলেন যে, এখনকার বালুচরী যা দেখে আমরা 'মুচ্ছো' যাই – তার তুলনা করাই চলে না।

আজকের বালুচরীতে প্রাচীন কারুকাজের ধাঁচটিকে বজায় রেখেছেন শিল্পীরা – আঁচলের বিশদ ও জটিল বুননীতে আর পাড়ের কাজ ও জমির বুটিতে। এখন বালুচরী বোনা হয় বিষ্ণুপুরে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগ্রাতে। বিভিন্ন রঙের সমাবেশ আজকের বালুচরীকে করে তুলেছে নয়ন মনোহর, যা দেখে আমাদের মুখের 'বাক্য হরে যায়'। তাহলে বিগত শতাব্দীর বালুচর দেখলে আমরা হয়ত সম্মোহিত হয়ে কেনবার কথা ভুলে যেতাম কিংবা যা দাম চাইতেন বিক্রেতা, তাই দিয়ে ফেলে দেউলে হয়ে বাড়ি ফিরতাম!

এ যুগের বালুচরীতে টানায় থাকে ব্যাঙ্গালোর শিল্ক, ডুড়ে আর পড়েনে মালদহের রেশম। প্রাচীন বুননীতে অনেক সময় লাগত এবং খরচও পড়ত প্রচুর। সেই জন্য 'জ্যাকার্ড' তাঁতের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। 'জ্যাকার্ড' কথাটা আমরা জানি সবাই কিন্তু যুৎসই বাংলাটা কোন অভিধানে পেলাম না। নামটা এসেছে আবিষ্কারক মারী জ্যাকার্ডের নাম থেকে (১৭৫২-১৮৩৪)। ইনি ছিলেন ফ্রান্সের লিওন (অথবা লিয়োঁ) শহরের বাসিন্দা। এই তাঁতে থাকে অসংখ্য সারি সারি কার্ড। সেই কার্ডগুলোতে থাকে ফুটো; নকশা অনুযায়ী হয় সেগুলোর অবস্থান। এই তাঁতে কাজ করেন পাঁচজন তাঁতি গ্রাফ পেপারে নকশাটা ছকে নিয়ে। বোনার সময়টা নির্ভর করে নকশার জটিলতার ওপরে। চীনের সিল্ক ফ্যাক্টরীতে দেখেছি এই পদ্ধতিটাকে কম্পিউটারের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়। তাতে মাত্র একজনই চালান সমস্ত বোনার কাজটা। হয়ত বালুচরীও কোনদিন কম্পিউটারাইজড্ হয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে বালুচরীর রোম্যান্স। কিন্তু আশা করি 'দেহ্লী হনুজ দূর অস্ত' (দিল্লী এখনও অনেক দূরে)।

আজকের বালুচরীর জনপ্রিয় বোনা গল্পে যাচ্ছে বিয়ের আসরে বৌ-মালা বদল, হোম, পাল্কীতে নববধূ বিভিন্ন সারিতে থাকে এক একটি দৃশ্য। সীতা-সমন্ত, অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, গীতোপদেশে সারথি শ্রীকৃষ্ণ, আঁচলে আর পাড়ে সার সার অশ্বারোহী সৈন্য – এসবও আজকের নকশায় খুবই চালু বুননী। এছাড়াও কল্কা, বাঁকুড়ার ঘোড়া এরাও স্থান পেয়েছে বালুচরীর আঁচলে ও পাড়ে। আঁচলের প্রধান নকশাকে দৃষ্টি আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য প্রতিটি নকশার চারদিকে গন্ডী টেনে দেন শিল্পীরা অর্থাৎ যাকে বলে 'বক্সিং দ্য ডিজাইন'। সাধারণত হাতির দাঁতেরও অর্থাৎ আইভরী জমিতে এক বা দু' রঙা সূতোর কাজ পাওয়া যাবে একটু নিচের দিকের দামে। দুটো রঙের আভাযুক্ত জমি, অর্থাৎ যাকে আমরা বলে থাকি শট্ কালার (Shot Colour) তাও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এখন। নীল, কালো, লাল, বাদামী, মেরুন, রাণী রং, পান্না সবুজ এগুলোই এখনকার ব্যবহৃত রঙ। খুব সূক্ষ্ম কাজে সাত রকম রঙের সূতোর ব্যবহার পর্যন্ত দেখা যায়। এসবই হলো আধুনিকতম সংযোজন। শাড়ির দাম বর্তমানে ২৫০০ টাকা থেকে ১২,০০০ টাকা অবধি পৌঁছায়। জরির ব্যবহারটা বালুচরীতে তেমন হয় না; বোদ্ধারা বলেন, আজকের নকল জরিতে বালুচরীর আভিজাত্য ক্ষুণ্ন হয়। জরির জায়গা নিয়েছে মুগার সূতো।

প্রতিটি বালুচরী শাড়ি তন্তুবায়-শিল্পীদের অশেষ ধৈর্য, দক্ষতা ও শিল্পের প্রতি আনুগত্যেরই নিদর্শন। বালুচরী কিনে হয়ত আমাদের প্রাচীন ও সমৃদ্ধ শিল্পের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কাজই করে চলেছি আমরা। কোনদিন হারিয়ে যাওয়া বালুচরীও সসম্মানে ফিরে আসবে, সেই আশা নিয়েই বাঙালী শিল্পগ্রাহীরা অপেক্ষায় রয়েছেন।

++++++++++++++++++++++

ইতিহাস তো সংগ্রহ হলো, কিন্তু আমার সেই একঘেঁয়ে হয়ে যাওয়া শাড়ির কী হবে? নিয়ে গেলাম কলকাতার একজন 'রংরেজের' কাছে। রংরেজ অর্থাৎ যিনি কাপড়ে রঙ করে দেন, ছাপা এবং বাঁন্ধনীর কাজও করেন দক্ষতার সঙ্গে। ইনি আমার অনেক একঘেঁয়ে শাড়িতে নতুন প্রাণ এনে দিয়েছেন। এক ঝলক দেখে নিয়ে বললেন, 'রেখে যান, দেখছি।' ক'দিন পরে তুলতে গিয়ে দেখি মুগার রং এ ঝলমল করছে আমার বালুচরী! বুঝলাম ইনিও এক জাত শিল্পী! ❐

অটোয়া, কানাডা

মার্চ ১৫, ২০০১।

মন হারাবার আজি বেলা

নাহিদ জামাল রিয়ানন

ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলিভেটরের (লিফট) সামনে এসে দাঁড়াতেই দেখা হয়ে যায় সিরাজ ভাইয়ের সাথে। সিরাজ ভাই এই স্কুলের বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সবচেয়ে বয়স্ক এবং বিশিষ্ট ভদ্রলোক হিসেবে পরিচিত। সব সময় পরিপাটি পোষাক-আশাক, প্যান্টের ভেতর সার্ট ইন করে পড়া, ইস্ত্রি করা ফুলহাতা শার্ট, পায়ে অক্সফোর্ড জুতো, কখনো কেউ সিরাজভাইকে জিন্‌স্ পড়তে দেখেছে কিনা সন্দেহ। রবিনকে দেখেই ঠোঁটের উপরের সুনিপুণভাবে চিকন করে কাটা লম্বা গোঁফ ছড়িয়ে সানন্দ সম্ভাষণ জানান সিরাজভাই।

: কেমন আছ রবিন?

: ভাল, আপনি কেমন আছেন সিরাজভাই?

: ভাল, কি বাড়ি ফিরবে এখন?

: হ্যাঁ, পাঁচটা বাজে, আজ আর কাজ নেই। দেখি আপনাদের এলাকার দিকেই যাব ভাবছি। রীতা ভাবী ইলিশ মাছের দাওয়াত দিয়েছেন। প্রথমে ভেবেছিলাম যাব না, তারপর ভাবলাম যাই, রাতের খাবারটা বিনা পয়সায় সেরে আসি। ঠোঁট ছড়িয়ে বিস্তারিত মুখে দাঁত বের করা তৃপ্তির হাসি হাসে রবিন।

: বাঃ ভালইতো, তা হঠাৎ ইলিশ মাছের দাওয়াত?

: উনি ফিয়েস্তা বাজারে (স্থানীয় কাঁচাবাজার সহ দৈনন্দিন বাজারের দোকান) গিয়ে দেখেন ফ্রোজেন ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে, তাও আবার প-াস্টিকের প্যাকেটে ভরা আস্ত ইলিশ মাছ, মোড়কের উপর সাঁটা সাদা কাগজে লাল কালিতে লেখা, "পিওর চাঁদপুর ব্র্যান্ড", পাশে বাংলাও লেখা আছে।

: ভাগ্যিস পিওর। বলে হা হা করে জোরে হাসেন সিরাজ ভাই। হাসে রবিনও, আর ওর মনে হয়, সিরাজ ভাইয়ের ঠাট্টাগুলো ঠিক-ওর বাবার ঠাট্টার মত মনে হয়।

টুং শব্দ করে এলিভেটর এসে থামল ওদের সামনে। এতক্ষণে রবিন খেয়াল করে সিরাজ ভাইয়ের পাশে কালো জিন্‌স্ আর মাটি মাটি রঙের শার্ট পড়া খাটো চুলের মেয়েটা আসলে বাঙালী, স্পষ্ট বাংলা কথা বলছে।

: সিরাজ ভাই আসি। এখন না গেলে শাট্‌ল বাসটা মিস্ করব, পরে দেখা হবে।

: ও হ্যাঁ, আমরাও যাব। তোমার সাথে রবিনের পরিচয় নেই বোধ হয়?

: না, বলে হাত বাড়িয়ে দেয় মেয়েটি। এক মুহূর্ত নিজেকে অপ্রস্তুত লাগে রবিনের। এমনিতে হয়ত বিদেশী কোন মেয়ের সাথে পরিচিত হলে নিজে থেকেই হাত বাড়িয়ে দিত সে, এক্ষেত্রে ব্যাপারটা যেন একটু অন্যরকম মনে হয় রবিনের। তাই মেয়েটা হাত বাড়িয়ে দিলেও নিজের হাতটা মিলানোর জন্যে সামনে বাড়িয়ে দিতে একটু দেরী হয় ওর। তারপর অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত কোনরকম অবস্থার সামাল দেবার চেষ্টায় সিমকীর সাথে হাত মেলায় রবিন।

: আমি সিমকী, কি স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী মেয়েটার, অনেকটা মোহের মধ্যে ডুবে যেয়ে ভাবে রবিন। তারপর ভদ্রতা রক্ষার নিয়ম অনুযায়ী 'আমি রবিন', বলে মাথা ঝাঁকায় ক্ষাণিকটা। একটু থেমে কিভেবে আবার সিমকীকে প্রশ্ন করে ও, "কি আন্ডারগ্র্যাড (ব্যাচেলর ডিগ্রী) নাকি গ্র্যাজুয়েট (মাস্টার্স বা তার উপরের স্তর) স্টুডেন্ট?"

: গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট, সংক্ষিপ্ত উত্তর সিমকীর।

: ও, শেষের পথে নাকি শুরু?

রবিনের কেমন যেন সম্বোধন ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তিতে কথা বলা শুনতে মজা লাগে সিমকীর। আগে হলে হয়ত বলত, 'আমাকে তুমি করে বলতে পারেন', আজকাল আর বলে না। কেনইবা মানুষের প্রথমে সরাসরি আপনি বলতে এত অসুবিধা? তুমি বলা যায় কিনা বুঝে নেবার জন্যে তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহার, ইদানিং এটা বেশ একটা মজার ব্যাপার মনে হয় ওর কাছে।

: অম্, আমি মাঝামাঝি। যেন একটু ভেবে উত্তর দিতে হল এমন ভাব করে জবাব দেয় সিমকী। কথা বলতে বলতে ওরা সবাই এলিভেটরে উঠে আসে।

: হেই সিমকী, এলিভেটরে উঠতেই লিয়ার প্রশ্ন শুনে ওর দিকে মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দেয় সিমকী, "হেই, লিয়া"।

: What's up? (কি খবর?) চলতি আমেরিকান সংস্কৃতির ঢঙে সিমকীর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর কথোপকথন চালিয়ে যায় ওর বন্ধু লিয়া।

: O, nothing much, how about you? একই ঢঙে উত্তর দেয় সিমকী।

: Just heading home. It's really pretty outside, would you like to walk home with me?

: Sure, that'll be a little exercise for me.

: Cool, 1 felt like walking but wanted to find a partner with me.

এলিভেটর থেকে নেমে বাংলাদেশী ভাইদের হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে, ব্যাগপ্যাকটা পিঠের ওপর ভাল করে টেনে নিয়ে লিয়া নামের কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েটার সাথে বাড়ি রওনা হয় সিমকী।

পেছনে দাঁড়িয়ে সিমকীর স্বচ্ছন্দ চলে যাওয়া দেখতে দেখতে সিরাজভাইয়ের দিকে তাকিয়ে সিমকীর দিকে হাত উঁচিয়ে অবাক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে রবিন, "বাংলাদেশী মেয়ে?"

: হ্যাঁ, মনে হয়না তাইনা? কেমন যেন ছেলে ছেলে ভাব।

: আচ্ছা? আমি কিন্তু তা ভাবিনি। আমার কাছে মনে হচ্ছিল ম্যাক্সিকান বা নেটিভ ইন্ডিয়ান। আপনি ছেলে ছেলে বলছেন কেন? ওকে দেখেত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ও একটা মেয়ে!

: তুমি তো এখনো ছোকড়া। চোখে এখনো রং ঢং আছে, তাই মেয়ে ছাড়া বাকী সব তোমার চোখ এড়িয়ে যায়। দেখনা, কেমন পিঠের উপর ব্যাগ চাপিয়ে, বুক উঁচিয়ে চলছে। আমাদের মেয়েরা চলে ব্যাগ কোলে নিয়ে, মাথা নামিয়ে।

: ওর পাশের কালো মেয়েটাতো এদেশীয়ই মনে হয়, ওতো একই ভাবে চলছে, ওকে ছেলে মনে হচ্ছে না কেন?
: আরে ধুর মিয়া, ওতো জাতেই পশ্চিমা, ওর আবার মেয়েলীভাব আসবে কোত্থেকে? সিরাজভাইয়ের কথার মানে আন্দাজ করতে পারলেও, কিছু না বলে নিজের পথে পা বাড়ায় রবিন।

রবিন এখনো ওর নিজের সংস্কৃতির সীমানা ঠিক করে উঠতে পারেনি। মেয়েটাকে দেখে ওর বেশ ভালই লেগেছে। যদিও আগ বাড়িয়ে এখনো বাঙালি মহিলাদের সাথে হাত মেলাতে পারে না, তবুও মেয়েটির সহজ বন্ধুসুলভ ব্যবহার বেশ ভাল লেগে যায় ওর। সিরাজভাই আমেরিকায় এসেছেন ডিভি ভিসা পেয়ে। গৃহবধূ স্ত্রী আর তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে ওনার সংসার। এখন এই বয়সে আবার মাস্টার্স করতে শুরু করেছেন যদি ভাল কোন চাকরি পাওয়া যায় এই আশায়। ওনার এই পড়াশুনা করে ভাল চাকরির খোঁজ করার মনোভাবটা ভাল লাগে রবিনের, কিন্তু যখন স্কুলের রিক্রিয়েশন সেন্টারে যেয়ে কাছাকাছি বয়েসী মেয়েগুলোকে ওদের মা'র সাথে মাঠে বসিয়ে রেখে, ছেলেটাকে নিয়ে টেবিল টেনিস খেলতে বা সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে যান তখন মনে হয় মেয়েগুলোকে উনি অবহেলা করছেন। মেয়েদের বয়স খুব বেশি হলে দশ কি এগার হবে। সেদিনতো কিছু না ভেবেই ওনার মেয়েদেরকে এক প্রশ্ন করে ওদের মাকে বোধহয় অপ্রস্তুতই করে দিয়েছিল রবিন। লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে সুইমিংপুলের বাইরের মাঠের মাঝ বরাবর হেঁটে কিছু নাস্তা করার জন্যে ক্যাফেটেরিয়ার দিকে হাঁটছিল ও। পথে সিরাজভাইয়ের স্ত্রী আর মেয়েদের সাথে দেখা।
: স্-লামালেকুম। কেমন আছেন ভাবী?
: ভাল, তুমি কেমন আছ রবিন?
: ভাল, এখানে বসে আছেন যে, সিরাজভাই কি লাইব্রেরীতে?
: না, ও ছেলেকে নিয়ে সাঁতার শেখাতে গেছে। আমরা মা-মেয়েরা গল্প করছি।
: তোমরা সাঁতার পার? কিছু না ভেবেই সিরাজভাইয়ের মেয়েদেরকে এই প্রশ্ন করে রবিন।
: না! মাথা নেড়ে একসাথে উত্তর দেয় মেয়েরা।
: তোমরা শিখতে চাওনা?
: হুঁ, কিন্তু বাবা বলেছেন, এখানে সুইম স্যুট ছাড়া সাঁতার কাটা যায় না, তাই আমরা যেতে পারি না। এবারের উত্তরটা আসে সিরাজভাইয়ের ছোট মেয়েটার কাছ থেকে। বড় মেয়েটা মুখ নিচু করে চুপচাপ বসে থাকে মায়ের পাশে। সাথে সাথে ওদের মা ছোট মেয়েটাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বলেন, "চুপ বেশি পট্‌পট্‌।"
: বাবাতো তা-ই বলেছেন না। নিজের কথাটা ঠিক প্রমাণ করার জন্যে পাল্টা জবাব দেয় সিরাজভাইয়ের ছোট মেয়ে। মা-মেয়ের মাঝে বিরক্তির সৃষ্টি করে সেদিন একেবারে বোকা বনে গিয়েছিল রবিন। তাড়াতাড়ি কি করবে বুঝতে না পেরে অস্বস্তি কাটাতে সেই মুহূর্তে ওখান থেকে চলে যাওয়াটাই ভাল মনে করে কোন রকম বিদায় নেবার জন্যে ব্যস্ত হয় রবিন, "আমার আবার একজনের সাথে দেখা করার কথা, আমি আসি হ্যাঁ, পরে দেখা হবে।" বলতে বলতে হাতঘড়িতে সময় দেখে তড়িৎ গতিতে ক্যাফেটারিয়ার দিকে হাঁটা দেয় ও! আসলে ওর জন্যে কেউ অপেক্ষা করছে না, তবু পারিবারিক দ্বন্দ্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসার এর চেয়ে অজুহাত আর খুঁজে পায় নি তখন। আজকাল আর কোন দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হতে ভাল লাগে না রবিনের। অথচ আগে ও এমন ছিল না। সবাইকে সব বিষয়ে প্রশ্ন করে লুকিয়ে রাখা বিশ্বাস, রাগ, ভুল বুঝাবুঝি সব কিছুর সমাধান না বের করা পর্যন্ত যেন থামতে চাইতনা ও। কিন্তু ওসবে মানুষ খুশি হয় না। সবাই সত্যটা লুকিয়ে রাখতে পারলেই যেন খুশি। সিরাজভাই ও তাঁর স্ত্রী দু'জনেই হয়ত ওনাদের মেয়েদের সুইম স্যুট পড়ে সাঁতার কাটা পছন্দ করেন না, অথচ একথা তাঁদের মেয়েদেরকে জানিয়ে দিয়েও কেমন যেন গোপন করতে চান। ক'দিন আগে ওদের ইউনিভার্সিটির একজন বাংলাদেশী শিক্ষক ফিজিক্সের প্রফেসর শহীদ ভাইয়ের সাথে ওনার স্ত্রীর চাকরি বিষয়ে কথা হচ্ছিল। উনি খোলাখুলিভাবে রবিনকে বললেন, "না বাঙালী মেয়েদের চাকরি করা মানায় না। তাছাড়া আমিও মেয়েদের চাকরি করা পছন্দ করি না।"
: ও, তা এত কষ্ট করে ভাবী পি.এইচ.ডি শেষ করেছেন, উনি ওনার ডিগ্রী নিয়ে ঘরে বসে থাকবেন? উল্টো প্রশ্ন করেই শহীদ ভাইয়ের কথার উত্তর দিয়েছিল রবিন।
: ঘরে বসে থাকবে কেন? আমাদের বাচ্চা আছে, বাচ্চার দেখাশোনা, সংসারের দেখাশোনা, এসব কি কম কাজ?
: আজকাল শিক্ষিত মেয়েরা ঘরের কাজ বাইরের কাজ একই সাথে করে।
: তুমি তো এখনো সংসারে আবদ্ধ হওনি, তাই মনটা ফুরফুরে। সবকিছুতেই তোমার খোলামেলা ভাব। বিয়ে কর সব ঠিক হয়ে যাবে।
ঠিক হয়ে যাবে বলতে কি বোঝালেন শহীদ ভাই, বোঝা গেল না। এদিকে, ওনার স্ত্রী নিজের জন্যে চাকুরি খুঁজছেন একথা তিনি নিজে রবিনকে বলেছেন। আরো বলেছেন, "এত কষ্ট করে পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করব না? তাছাড়া আমার স্বামীর তো এ বিষয়ে কোন আপত্তি নেই।" গন্ডগোলটা কোথায় বোঝে না রবিন। হয়ত শহীদ ভাই বাড়ি গিয়ে বউকে তাঁর বিশ্বাসের কথা বলেন না অথবা ওনার স্ত্রীর নিজের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে চাকরি খুঁজছেন, আর নিজের মনের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলার জন্যে সবার কাছে তার চাকরি খোঁজার কারণ বলে বেড়াচেছন। চাকরি তিনি খুঁজছেন, সেটাই স্বাভাবিক মনে হয় রবিনের কাছে। সে জন্যে স্বামীর আপত্তি বা নিজের ইচছা পোষণের পেছনে কোন কারণ দেখানোর দরকার হতে যাবে কেন? কেন যে সবাই সহজেই খুশী মনে তাদের বিশ্বাসের কথাটা জানাতে পারে না। তাহলে সবকিছু বড় খোলাসা আর সহজ হয়ে যেত। কোন ভুল বোঝাবুঝি থাকত না। আশেপাশের মানুষের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে যত বেশি জানে ততই অবাক হয় রবিন। আপাতঃদৃষ্টিতে সবাইকে সুখী মনে হয়, মনের ভেতর এত সংঘর্ষ নিয়ে এরা সুখেই বা থাকে কিভাবে? অন্তত রবিন জানে নিজের মনে দ্বন্দ্ব নিয়ে কখনোই সুখের ঘুম ঘুমাতে পারে না ও।

পরদিন ভরা বাদলের দিন। সাথে ছাতা নেই বলে বাড়ি ফেরার পথে স্কুলের সামনের বারান্দায় বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে রবিন। মনটা ঘরে বসে মুড়ি ভাজা খেতে চাইছে, আর ছোট বেলার মত কাঁথা মুড়ি দিয়ে জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখতে ইচেছ হচেছ। বাড়ি ফেরার তাড়া অনুভব করে ও। তারপরই ওর হৃদয়ের ভেতরের শূন্য ভাবটা শ্বাসনালী দিয়ে ভিতরে ঢুকে আসা বাতাস ঠেলে বেড়িয়ে আসতে চায় মনে হয়। বাড়ি মানেতো ওর ডরমিটরী। ছোট্ট ঘরে একটা বিছানা তার পড়ার টেবিল, ছোট্ট ক্লজেটে (ঘরের ভেতরের কাপড় চোপড় রাখার মত স্টোর বিশেষ) একটার বেশি স্যুটকেস আটে না। তার উপরে একটা কাঠের রডের মত, তাতে ঝোলানো কিছু শার্ট-প্যান্ট। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিল্ডিং বলে দেয়ালের ছোট্ট কাঁচ ঢাকা জানালাটাও একেবারে সিল করে বন্ধ, কখনো খোলার উপায় নেই। তবুও মনে হয়, ওখানেই ফিরে যেতে হবে, এখুনি। পড়ার চেয়ারটা জানালার পাশে টেনে নিজের গালটা ঠেকিয়ে রাখবে জানালার কাঁচের গায়। বাইরের ঠান্ডা এসে শীতল ছোঁয়া দেবে ওর গালে, ওর মনে! সেই কবেকার উর্মির লেখা প্রেমপত্রের মত, "আমি জানালার গরাদে মাথা রেখে বসে আছি, বাইরে হিমেল রাত। শিশিরে ভেজা বাতাস ছুঁয়ে ভিজে যাচ্ছে আমার মুখ। সেই বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছ তুমি, ঘুরে বেড়াচ্ছ শহরের আরেক মাথায়। অথচ তোমারই ছোঁয়া টের পাচ্ছি আমি এই এতদূরে আমার জানালায় ছুঁয়ে যাওয়া ভেজা বাতাসে। তুমি পাঠিয়েছ সেই ছোঁয়া?" লাইনগুলো কি স্পষ্ট মনে আছে রবিনের! নিজের স্মরণ শক্তি দেখে নিজেই অবাক হয় ও। ঐ চিঠি পড়ে রবিনের মনে হয়েছিল কালিদাসের মেঘদূতের মত, শীতল হাওয়ার ভালবাসার দূত গিয়েছিল ওর হৃদয় থেকে উর্মির কাছে। অনেক ভেবেও সেই রাতে ঠিক ঐ সময়টাতে ও কোথায় ছিল, কি করছিল কিছুতেই মনে করতে পারে নি

রবিন। তবুও উর্মিকে খুশি করার জন্য বলেছিল, “তুমি যখন জানালার গরাদে মাথা ঠেকিয়ে হিমেল হাওয়া থেকে আমার ছোঁয়া নিচ্ছিলে আমি তখন আমাদের মোড়ের চায়ের দোকানটায় বসে রাতের শেষ সিগারেট টানছিলাম, আর চাদরমুড়ি দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে আছি ভাবছিলাম, অথচ তবুও তুমি হিমেল হাওয়া টের পাচ্ছিলে! আমার হাতের ছোঁয়া টের পাওনি?'' রবিনের কথায় হা হা করে হেসে উঠেছিল উর্মি, খুব প্রাণখোলা হাসি ছিল মেয়েটার। উর্মি বেশি বই পড়ে না, তাই কালিদাসের কথা ওকে আর বলেনি রবিন। বললে হয়ত ও প্রশ্ন করে বসত, “কালিদাস কে? মেঘদূত আবার কি জিনিষ?'' শুধু সাম্প্রতিক হালকা প্রেমের উপন্যাস ছাড়া আর কিছুই পড়তে পছন্দ করত না উর্মি। কিন্তু এত সুন্দর চিঠি লিখত ও। বাংলা সাহিত্য ভাল করে পড়া থাকলে হয়ত লেখিকাই হয়ে যেত একদিন। কালিদাসের উপমা নিয়ে কথা বলতে না পারলেও উর্মিকে ভীষণ ভাল লাগত রবিনের। কিসের আর্কষণ ছিল ঐ সাধারণ মেয়েটার মাঝে কখনো ভেবে দেখেনি একবার। রবিনের উপর উর্মির অগাধ বিশ্বাস, রবিনকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ ভাবা, আর প্রতিরাতে লেখা উর্মির ভালবাসা ভরা চিঠি, ওর প্রাণখোলা হাসি, সবকিছু মিলে মেয়েটাকে ঘোরের মত ভালবাসত ও। অথচ সেই ভালবাসার মেয়েটিকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি আর। উর্মি ছিল গতানুগতিক নিয়মের শান্তিপ্রিয় মেয়ে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যেমন স্বভাবে ছিল না ওর, তেমনি এত প্রবল ভালবাসার শক্তি দিয়েও সেটা বাস্তবায়িত করার জন্যে নিয়মের বিরুদ্ধে অপেক্ষা করা সম্ভব হয় নি ওর পক্ষে। রবিনের পড়াশোনা শেষ হবার আগেই বিয়ে ঠিক হয়ে যায় উর্মির। চাকরিবিহীন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসা মফস্বলের ছেলে রবিন কোনরকম টিউশনি করে নিজের পড়াশোনা চালায়। তার কাছে বড় সরকারী চাকুরে বাবার মেয়ে উর্মির বিয়ে দেবার প্রশ্নই ওঠে না। উর্মির যেন স্বপ্ন ছিল রবিন বুক ফুলিয়ে যাদুমন্ত্র বা সিনেমার মত রাত পোহাবার আগেই একটা চাকুরি যোগাড় করে একগোছা ফুল হাতে নিয়ে উর্মির দরজায় এসে কড়া নাড়বে। দরজা খুলে অবাক হয়ে বেরিয়ে আসবে উর্মি, তারপর ঠিক টেলিভিশনে দেখা নাটকের মত রবিন বলবে, “আমি এসেছি উর্মি, দেখ তোমার জন্যে আমি সব পারি!'' উর্মির জন্যে যে রবিনের সব পারতে ইচ্ছে করেনি তা নয়। কিন্তু বাস্তব যে তা নয়। উর্মির মত রবিনের বাবা নেই, সমাজের বিত্ত বা উপরের স্তরের লোকজন কোনটাই নেই। তাই সমস্ত স্বপ্ন হলের ছোট্ট চৌকির বিছানায় বালিশের নীচে চেপে উর্মির বিয়ের দিন সারাদিন চোখ বুঁজে কাটিয়েছে রবিন। যেন বাস্তবে না হলেও কল্পলোকেও যদি ধরা দেয় ওর মনের স্বপ্নগুলো। একটুর জন্যে হলেও হয়ত রবিন ছুঁয়ে দেখতে পারবে উর্মির গাল। কে জানে হয়ত উর্মিও টের পাবে সেই পরশ ওর কল্পনায়।

উর্মি হারিয়ে গেছে সেই কবে, তবু আজও কোন কারণে হৃদয়টা শূন্য মনে হলেই ওর কথা মনে পড়ে রবিনের। কেন মনে পড়ে বলতে পারে না ও। হয়ত জীবনের প্রথম প্রেম সত্যি সত্যিই দাগ কেটে যায় মনে। ওই ছাঁচে মেলার মত আরেকটা স্বপ্ন যতদিন হৃদয়ে বসানো না যায়, ততদিন হয়তবা সারাজীবন বালিশের নীচে লুকিয়ে রাখা স্বপ্নের ভেতর শূন্যতা হাতড়ে বেড়ায় মানুষ। মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে, অবর্ণনীয় সেই অনুভূতি। এমন হলে সারাটা সন্ধ্যা খারাপ কাটে রবিনের। নিঃসঙ্গতা এসে ভীড় করে মনে, আজকাল হৃদয়ের ছাঁচটাকে ভাঙতে চায় ও। এদেশের পশ্চিমা ছেলেমেয়েদের মত ভাবতে চায়, “তাতে কি হয়েছে একজন একজনের সাথে ভাব ছিল, জীবনের পথে চলে অনেক কিছু শেখার মত এটাও একটা অভিজ্ঞতা বৈকি, এ হল নিজেকে চেনার আর একটা উপায়। সব স্বপ্ন বাস্তবে পূর্ণতা লাভ করবে এমনটি ভাবা আর বোকা হয়ে বেঁচে থাকা একই কথা। খুব কম মানুষের জীবনেই তাদের প্রথম প্রেম পূর্ণতা লাভ করে। তাই বলে পৃথিবী কি থেমে থাকে কখনো? কখনো নয়। এটা জীবনের সাথে সমঝোতা, শিক্ষার ব্যাপার, ম্যাচুওরিটির ব্যাপার। বাংলাদেশে এমন হলে ভালই হত। আসলে ওখানকার সমাজে তো ছেলেমেয়ে খোলাখুলি একসাথে বসে কথা বলাই এখনো মোটামুটি অগ্রহণযোগ্য। তাই কিশোর আর যুবক বয়সের সন্ধিক্ষণে কেউ একটু ভালবাসলে, প্রাণ খুলে হাসলেই মনে হয় পৃথিবীতে সব পাওয়া হয়ে গেছে, এখন সংসার করতে পারার মাঝেই জীবনের বাকী পূর্ণতা। যেন সংসার করা ছাড়া মানুষের জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে একথা সেই মুহূর্তে বেমালুম ভুলে যায় সবাই। আমেরিকায় রবিনের বিত্ত নিয়ে প্রশ্ন করে না কেউ। দিব্যি সবার সাথে খাচেছ-দাচেছ, উঠছে বসছে, এদেশের মানুষের কাছেও আরো অনেকের মতোই একজন বিদেশী ইমিগ্র্যান্ট, আর বাঙালিদের কাছে? ও যে আমেরিকায় মাস্টার্স করছে, নিজের খরচে নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যাচেছ, তারপর একদিন এদেশে চাকরি করবে, গ্রীন কার্ড হবে। এটাইতো এখন দেশী সমাজে ওর বড় পরিচয়, নাইবা থাকল ওর বিত্তবান পিতা তার পরিচয় নিয়ে। রাজধানী ঢাকার চাকরির জন্যেতো আর ঘুরতে হবে না ওকে। কেউ জানবে না, ওর বাসায় কি রঙের আর কি কাপড়ের পর্দা ঝোলে। তা দিয়ে কেউ ওর সামাজিক অবস্থান বিচার করার সুযোগ পাবে না আর।

বাতাসও বৃষ্টির সাথে পাল-া দিয়ে বইতে শুরু করেছে মনে হয়। এক ঝাপটা বৃষ্টি এলে প্রায় ভিজিয়ে দিয়ে যায় রবিনকে। বাধ্য হয়ে ভাবনার অন্ত টেনে বারান্দা ছেড়ে স্কুল বিল্ডিং-এর ভেতরে ফিরে আসে ও। হাতঘড়িতে সময় দেখে ফিরে যাবার আগে স্টুডেন্ট মেইল বক্সে ওর কোন চিঠি আছে কিনা দেখে নেবার জন্যে ছাত্রদের মেইল রুমের দিকে রওনা হয় সে। হঠাৎ মেইল রুমের কাছে আসতেই ভেতর থেকে মহিলা কণ্ঠে স্পষ্ট বাংলায় রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে মনে হয় ওর। বুকের উপর এক দমক ঝড়ো বাতাসের মত আচমকা একটা ধাক্কা টের পায় রবিন। হ্যালুসিনেশন হচ্ছে না তো ওর! এক মুহূর্ত নিজের কানকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। আজকের এই তর বর্ষার দিন কি ওকে এতটাই কাবু করে দিল? না, কোন অডিটরী হ্যালুসিনেশন নয়, মেইল রুম থেকে স্পষ্ট ভেসে আসছে সুর

“মন হারাবার আজি বেলা, পথ ভুলিবার খেলা
মন চায়, মন চায়, হৃদয় জড়াতে কারো চির ঋণে
আজি ঝর ঝর মুখর বাদল দিনে...”

সত্যিই মনটা হারিয়ে যাবার মত দিন আজ। কয়েক সেকেণ্ড থেকে নিজের গা ছুঁয়ে বাস্তব পরীক্ষা করে নেয় রবিন। গানের সুর তখনো চলছে। ঘরের ভেতরে ঢুকে একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায় ও। সিমকী গুণ গুণ করে গান গাইছে। সেই মেয়েটি, যাকে প্রথম দেখায় বাংলাদেশের মেয়ে ভাবতে পারেনি রবিন, সেই মেয়েটি বাংলা গান গাইবে এ কথাই ওর মাথায় আসা কঠিন, তার উপর আবার রবীন্দ্রসঙ্গীত।

: সিমকী না? কিছু না ভেবেই কেমন যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে পিছন দিক থেকে মেয়েটিকে ডাকে রবিন।

: হুঁ, কি খবর রবিন ভাই? নিজের নাম শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে স্বভাব সুলভ সহজ ভঙ্গিতে ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে কথা বলে সিমকী।

“দারুন মেয়ে” বাইরের দমকা হাওয়ার মতই আচমকা একথা মনে আসে রবিনের। দেখে মনেই হয় না বাংলাদেশে বড় হয়েছে, এই যেমন ওর পোষাক, মনে মনে একটা দেশী মেয়ের কথা চিন্তা করলে সালওয়ারকামিজ বা শাড়ি ছাড়া অন্য কিছু মাথায় আসে না কেন? কিন্তু সিমকীকে মনে হয় ওসবে মানাবে না, অথচ ওর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে কি ভালই না লাগছে। মাথার ভেতর সমুদ্রের জলের মত ছুটে আসছে আবোল তাবোল ভাবনা। একটু লজ্জাই পায় যেন রবিন। মনে মনে সিমকীকে ভাল লেগে যায় ওর। তবে কি ওর ভেতর লুকিয়ে থাকা স্বপ্নের ছাঁচটা ভেঙ্গে যাচ্ছে? ওকি ওর শূন্যতার অনুভূতি থেকে মুক্ত? সিমকীর সাথে আরো কথা বলতে ইচ্ছে করছে ওর। মাথার ভেতর একরাশ কথা নিয়েও মুখ দিয়ে একটা শব্দও উচচারণ করতে পারছেনা ও।

জিভ আটকে আসছে মনে হয়। নিজের মেইল বক্স থেকে কিছু কাগজ তুলে নিয়ে যেন একটা বিশেষ জরুরি কিছু পেয়েছে এমনি ভাবে মুখ গুঁজে ওগুলো দেখতে দেখতে 'আমি হ্যাঁ' বলে মেইল রুম থেকে বেরিয়ে আসে রবিন।

: আচ্ছা দেখা হবে। আবারো সহজ উত্তর, কথাগুলো কেমন যেন নাটক সিনেমার মুখস্ত ডায়ালগের মত বের হয়ে আসে মেয়েটির মুখ থেকে।

রবিনের পেছন পেছন বেরিয়ে আসে সিমকী। বাইরে তখন জোড়ে বৃষ্টি চলছে, আজ ছাতা আনেনি ও। তাই আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরো অনেকের মতই বাইরে বের হবার কাঁচের দরজাটার ভেতরের দিকে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে শুরু করে সিমকী।

: বৃষ্টি হলে অনর্থকই বাড়ির কথা মনে পড়ে বারবার। রবিনের কথা শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকিয়ে স্বল্প হেসে উত্তর দেয় সিমকী, "হুঁ"।

: গানের গলাতো ভালই! রবিনের এবারের কথায় একটু জোরেই হেসে ফেলে সিমকী। লোকটি প্রথম দিন থেকে ওর সাথে তৃতীয় ব্যক্তির সুরে কথা বলছে। যদিও এ ধরনের ঘটনায় ও অভ্যস্ত, এই লোকটার মাঝে কি যেন একটা আছে মনে হয় ওর, এ যেন সিমকীকে অন্যান্য দেশীদের মত একভাবে দেখে না। নিজে থেকেই এই লোকটির অস্বস্তিবোধ দূর করতে ইচ্ছে হয় সিমকীর, ও করেও তাই, ঘাড় কাত করে রবিনের দিকে ঘুরে বসে, "আপনি আমাকে তুমি করে বলতে পারেন। আমি কিছু মনে করব না?" সিমকীর এমন সরাসরি কথা শুনে ভাল লাগে রবিনের আবার একই সাথে এটি মেয়েটার অবাঙালীত্বের আর একটি উদাহরণ একথাও মনে হয় ওর। আঙুল দিয়ে চিহ্ন করে বলতে পারবে না, তবে রবিনের মনে হয় এমনি আরো অনেক স্পষ্ট ব্যবহারই সাধারণত কোন বাংলাদেশী মেয়ের কাছ থেকে কেউ আশা করে না। এতে কোন ভুল আছে মনে হয় না ওর, তবে কেন যে সিরাজ ভাই বা রীতা ভাবী সিমকী সম্বন্ধে অযৌক্তিক সব ঘটনা নিয়ে ওকে অপছন্দের কথা বলে তা যেন এবার পরিষ্কার বুঝতে পারে রবিন।

: Hey Simky, waiting for the rain to stop?

: Yeap.

ওদের পেছন দিক থেকে এগিয়ে আসা সোনালী চুলের শ্বেতাঙ্গ একটা ছেলের প্রশ্নে বিদেশী কায়দায় উত্তর দেয় সিমকী।

ছেলেটাকে আগে স্কুলেই দেখেছে রবিন, তবে এর নাম জানে না। সিমকীর এই আরেকটা দিক অবাক ভাললাগা নিয়ে খেয়াল করে রবিন। দেশী বিদেশী সবার সাথে ওর একই রকম স্বাচছন্দ চলাচল, কথাবার্তা। অন্যরা কি ভাবল, দেশী ভাইরা কি ওর ব্যাকপ্যাক কাঁধে নিয়ে চলা নিয়ে কিছু মনে করবে কি না, তা নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই ওর।

: You can ride with me, I have my car parked right outside.

: O, great, thanks.

ছেলেটার সাথে চলে যাওয়া ঠিক হতেই রবিনের দিকে ঘুরে, "আসি, বাই" বলে বন্ধুর পেছন পেছন সামনের কাঁচের দরজা খুলে বেরিয়ে যায় সিমকী। একটুখানি দরজা খোলা পেয়ে এক পলক ভেজা বাতাস হিম ছোঁয়া দিয়ে যায় রবিনের গায়ে। হাতের লোমগুলো কাঁটা দিয়ে ওঠে। বাইরে যেয়ে সিমকীর বন্ধু ওদের দু'জনের মাথায় ছাতা খুলে ধরে। ওদের দু'জনের কাঁধেই ব্যাকপ্যাক। স্কুলের সামনের ছোট্ট রাস্তা পেরিয়ে ওপারের পার্কিং স্পটে গিয়ে বৃষ্টির ভেতর ঝাপসা হয়ে যায় ওরা। এখন আর সিমকীকে বাংলাদেশী মেয়ে মনে হচ্ছে না রবিনের। একটু আগের রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া মেয়েটার চট্ করেই এমন রূপ বদলে যায় কিভাবে ভাবতে যেয়েও নিজেকে প্রশ্ন করে একবার শুধরে নেবার চেষ্টা করে ও, "বাকী সবার মত ও নিজেও কি সিমকীর বাঙালীত্বের বিচার করতে নেমে গেল? আপাতঃদৃষ্টিতে তাইতো মনে হচ্ছে। অথচ মেয়েটিতো আসলে এদেশে যা স্বাভাবিক তা-ই করছে। একটা এদেশী মেয়ে এভাবে ক্লাসের আরেকজন ছেলের সাথে একছাতার নীচে হেঁটে গেলে কেউ কিছুই ভাবতো না। আমাদের চোখগুলো কোন নিয়মের ব্যতিক্রম সহ্য করতে অভ্যস্ত নয় বোধ হয়, একটুতেই সব বদলে গেল ভেবে তবে অস্থির হয়ে যাই আমরা, নাকি এটাই মানুষের ধর্ম। পরিবর্তন ভালো লাগে না আমাদের। আচ্ছা রবিন বললেও কি ঠিক এমনি রবিনের সাথে এক ছাতার নিচে হেঁটে যেত সিমকী?" হঠাৎ করেই প্রশ্নটা মাথায় আসায় নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হয় ওর, "ওকি আবারো সিমকীর সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের বিচার করতে চাইছে? ও কি নিজেই কখনো এমনি বলবে সিমকীকে। ধ্যাৎ কি যা তা ভাবছি, মেয়েটা কি আমাকে পেয়ে বসল নাকি?" জোর করে মন থেকে ভাবনাটা সরাতে যেয়েও পারে না, আবারো ভাবতে থাকে ও। "আসলে বন্ধুরাতো যেতেই পারে একসাথে। তাই না? তাই কি? সিমকী ছেলেটার সাথে এক গাড়িতে করে ওর বাড়ি যাবে, ছেলেটি কি ওখানে যেয়ে সিমকীর অ্যাপার্টমেন্টে ক্ষানিকক্ষণ বসবে? বাংলাদেশে একই ক্লাসের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়, কিন্তু ওরা কি এক সাথে কোথাও যায়? একটা ছেলে আর মেয়ে বন্ধু হলে কি হুট করে একসাথে বেরিয়ে পড়ে?" মনে মনে প্রশ্নোত্তর ভাবনার বানে ভাসতে ভাসতে রীতা ভাবীর কথা মনে পড়ে রবিনের। সেদিন ভাবীর রান্না খেতে খেতে গল্প করছিল ওরা। শরীফ ভাই, রীতা ভাবীর বর, তখনো কাজ শেষে ঘরে ফেরেন নি। গল্পে গল্পে সিমকীর কথা তুলেছিল রবিন। সাথে সাথে অনেকটা রেগে যাবার মত ভঙ্গিতে রীতা ভাবী বলেছিলেন, "ওই মেয়েটার সাথে আবার তোমার কি? ওতো একটা ভবঘুরে ঘোড়ামার্কা মেয়ে। রাতে বিরেতে দেখা যাবে সাদা-কালো বিদেশী ছেলেদের সাথে বাইরে ঘুরছে। জান না, সেদিন শহীদ ভাবী (শহীদ ভাইয়ের বউ) ওকে রাত দশটার সময় ফিয়েস্তা বাজারের সামনে দেখেছে। এসব কি আমাদের মানায়?" ভাবী যে মেয়েটার বিষয়ে এমনভাবে কথা বলবে ভাবতে পারেনি রবিন। অথচ মেয়েটি নাকি কখনো রীতা ভাবীদের বাসায় আসেনি, রীতা ভাবী কখনোই সিমকীর সঙ্গে সরাসরি কথাও বলেননি, তাতেই উনি শুনে মেয়েটি সম্পর্কে এতকিছু ভেবে ফেলেছেন! বিষয়টা মোটেই সহজভাবে নিতে পারেনি রবিন। ফিয়েস্তা বাজার সব মানুষের দৈনন্দিন বাজার করার জায়গা, এই জনবহুল জায়গায়, কার সাথে কে বাজার করতে গেল তাতে কার বা কি আসে যায়, এতে দোষের কি থাকতে পারে বুঝে উঠতে পারে না রবিন। "বুঝেছি তোমাকে বিয়ে করাতে হবে, নয়তো তুমি ওসব বুঝবে না।" নিজের সাথে রবিনের অমতের কথা জেনে, এর একটা সমাধান খুঁজে পেতেই যেন কথাটা বলেছিলেন ভাবী। আজ এই মন হারিয়ে যাওয়া বর্ষার দিনে উল্টো পাল্টা অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে আর একটা অদ্ভুত বিষয় মনে আসে রবিনের, "রীতা ভাবীতো শুধু ওর বন্ধু, রবিনের সাথে তো উনি মাঝে মাঝে মলে (কাপড়চোপড় ইত্যাদির বাজার) বাজার করতে বা ঘুরতে যান। ওনার বরের সময় নেই বলে দেবর সুলভ রবিনের সাথে ঘুরে বেড়ান তিনি। রবিন যখন তখন ওনাদের বাসায় যায়, ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে ভাবীর সাথে দীর্ঘ সময় বসে গল্প করে। সেটাতো কখনো কেউ অস্বাভাবিক চোখে দেখেছে বলে শোনে নি রবিন! সিমকী আর ভাবীর মধ্যে পার্থক্য মাত্র একটাই ওদের একজন বিবাহিত আর একজন বিবাহিত নয়। তবে কি একই আচরণ বিবাহিত বলেই ভাবীর বেলায় ঠিক আর সিমকী একা থাকে বলে ওর বেলায় ঠিক নয়? নাকি সিমকী বিদেশী ছেলেদের সাথে ঘোরে বলেই সবাই এমন বাঁকা চোখে দেখে। আচছা ও যদি রবিনের সাথে ঘুরত তাহলেও কি রীতা ভাবী ও আরো সবাই সিমকীর সম্বন্ধে একই রকম কথা বলত।"

মনে মনে বিশ্বাসের গাঁথুনি খুঁজে পায় রবিন। আজ এই বর্ষা ভেজা বিকেলে সবার অপছন্দের মেয়েটিকেই ভালো লেগে যায় ওর। ❐

হিউস্টন, টেক্সাস।